দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ সমাচার

স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ এম আমানুল্লাহ সহযোগী একটি সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ে ছেলেখেলার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু এই দৈনিকটি দেশের চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ে যে প্রতিবেদনটি ছাপিয়েছে এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আমাদের কাছে যে সমস্ত তথ্য আসে তা রীতিমতো আতঙ্কজনক বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী যতই বলুন, আসলে দেশের চিকিৎসা শিক্ষার হালচাল ছেলেখেলারই নামান্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। খবরে প্রকাশ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসহ ন্যূনতম শর্তাবলি পূরণ না করে দেশের অধিকাংশ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ দেদারছে ছাত্র ভর্তি করছে। জানা গেছে, দেশে বর্তমানে ত্রিশটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের অস্তিত্ব রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি অনুমোদন রয়েছে মাত্র আটটির। বাকিগুলো চলছে অনুমোদন ছাড়াই। অথচ অনুমোদনহীন এই মেডিক্যাল কলেজগুলো ছাত্রপিছু দু'আড়াই লাখ টাকা নিয়ে ছাত্র ভর্তি করছে, এমন অভিযোগ উঠেছে। চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান রক্ষার প্রশ্নটি এখানে একেবারেই গৌণ। মান নিয়ন্ত্রণের কোন বালাই নেই। এ যেন সাধারণ শিক্ষার মতো অলিতে গলিতে কোচিং সেন্টার গড়ে তোলার ব্যবসা।

এখানে যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়ে একমাত্র টাকার জোরেই তারা এ সমস্ত মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হচ্ছে। তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। পাস করে বেরিয়ে আসলেও পরবর্তীতে ডাক্তার হয়ে তারা মানুষ বাঁচাতে না মারতে কোন্‌টায় পারঙ্গমতা অর্জন করবে সেটাই প্রশ্ন।

আমরা জানি ৯০-এর দশকে সরকার যখন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের কথাও উচ্চারিত হয়েছিল। একটি নীতিমালাও প্রণয়ন করা হয়। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করতে গেলে ন্যূনতম কি কি থাকতে হবে সে বিষয়ে সবকিছু স্পষ্ট করে দেয়া হয় নীতিমালায়। একেবারে মৌলিক শর্তই হচ্ছে প্রতিবর্ষে ৫০ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে হবে। ছাত্রপিছু ৫টি বেড অর্থাৎ ২৫০ বেডের একটি হাসপাতাল থাকতে হবে— যেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা নেবে হাতে-কলমে। কেবল ২৫০ বেডের হাসপাতাল থাকলেই হবে না, এর কমপক্ষে ৬০ শতাংশ বেডে রোগী থাকতে হবে সবসময়। এসব শর্ত পূরণ করলেই কেবল সরকারি অনুমোদন পাওয়া সম্ভব।

তার আগে অবশ্য নিতে হবে বিএমডিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাফিলিয়েশন। জানা গেছে, এ দুটো প্রতিষ্ঠান থেকে এ্যাফিলিয়েশন পাওয়া গেলেও সরকারি অনুমোদনের আগে অবকাঠামোগত শর্তাবলি পূরণ হয়েছে কিনা তা দেখা হয়ে থাকে। তা হলে কিসের ভিত্তিতে অনুমোদনহীন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলো ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে, সেটা রহস্যাবৃত।

উল্লেখ্য, এই কলেজগুলোর প্রকৃত অবস্থান কোথায় তা দেখার জন্যে সরকার গত এপ্রিল মাসে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেন। মে মাসে টাস্কফোর্সের তদন্ত রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হলেও এখনও তা প্রকাশ করা হয়নি। পত্রিকায় রিপোর্ট সম্পর্কে যেটুকু খবর বেরিয়েছে তাতে জানা যায় টাস্কফোর্স বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর মধ্যে ১২টি সম্পর্কে একেবারেই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করছে। অথচ লাখ লাখ টাকা নিয়ে এরা ছাত্রভর্তি করেই চলেছে। এটা কি করে সম্ভব হলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা। শোনা যায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে মোটা অংকের লেনদেনের ব্যবস্থা করলেই নাকি ভর্তির অনুমতি মেলে। তা না হলে সিলেটের একটি ৫০ বেডসম্পন্ন ক্লিনিকেরও মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, এমন ধরনের খবর প্রকাশিত হয় কিভাবে! আমরা এর সত্যাসত্য যাচাই করে দেখতে বলছি কর্তৃপক্ষকে।

সার্বিক অর্থেই আমাদের দেশের চিকিৎসা শিক্ষার মান, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং চিকিৎসক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতার নিচে অবস্থান করছে। এ থেকে উত্তরণের কথা না ভেবে আরো অধোগতির দিকে যাওয়াটা নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের কার্যক্রমও এ দৃষ্টির আলোকেই বিচার্য বলে আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গড়িমসি কিংবা স্ববিরোধিতা গোটা পরিস্থিতিকেই জটিল করে তুলবে।